সা ত দি ন

২২ অক্টোবর : সারাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু হয়েছে।

সিলেট জৈন্তাপুর ও সাতক্ষীরায় কলারোয়া সীমান্তে বিএসএফ-এর গুলিতে ২ জন বাংলাদেশী নিহত।

২৩ অক্টোবর : সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে দায়ের করা বাড়ি সজ্জিতকরণ মামলা খারিজ করেছে হাইকোর্ট।

২৪ অক্টোবর : অষ্টম জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ৫৬ জন এমপি শপথ গ্রহণ করেছেন।

সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান হত্যা মামলাটি দীর্ঘ ২০ বছর পর সাক্ষীর অভাবে খারিজ করা হয়েছে।

পাবনায় আওয়ামী লীগ-বিএনপি সংঘর্ষে প্রায় ৪০ জন আহত।

২৫ অক্টোবর : মার্কিন রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশকে গ্যাস রফতানির বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পরামর্শ দিয়েছেন।

২৬ অক্টোবর : মানিকগঞ্জ-২ আসনে উপনির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে পুলিশের সঙ্গে বিএনপি কর্মী ও এলাকাবাসীদের সংঘর্ষে প্রায় ৩০ জন আহত।

২৭ অক্টোবর : ভারত সরকারের বিশেষ দূত ব্রজেশ মিশ্রকে সার্ক সম্মেলন সক্রিয় করা এবং বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া।

২৮ অক্টোবর : অষ্টম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত এবং ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার জাতীয় সংসদের স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন।

হাসিনার বোধোদয় কিন্তু!

সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া শেখ হাসিনা ও তার দলের নির্বাহী কমিটির সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। কিন্তু সংসদ অধিবেশনে যোগ না দেয়ার তাদের সিদ্ধান্ত এরপরও যে বাধা সৃষ্টি করে রাখলো সেটাও দলের জন্য ক্ষতিকর হবে বলে সবার ধারণা...লিখেছেন অনিরুদ্ধ ইসলাম

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা তার দলের সংসদ সদস্যদের নিয়ে শপথ নিয়েছেন অবশেষে। নতুন সংসদ বসার পূর্বে পয়লা অক্টোবরের নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যরা শপথ নেবেন কিনা এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছিল বেশকিছু দিন। দলের অভ্যন্তরেও টানাপোড়ন চলছিল বেশ ভালোই। এই এক ইস্যুতেই দলের নির্বাহী কমিটির দীর্ঘ বৈঠক তার প্রমাণ। সিদ্ধান্ত নিতে ঐ বৈঠক মুলতবিও করতে হয়েছে কয়েক দফা। তারপর নির্বাহী কমিটি ঐ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সক্ষম হয়। তবে শপথ নিলেও আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যরা সংসদের অধিবেশনে যোগ দেবেন না। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা দলের সংসদ সদস্যদের শপথ নেয়ার ব্যাপারে বলতে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছেন যে, জনগণ তাদের ভোট দিয়েছে। সেই জনগণের প্রতি সম্মান দেখাতে তারা সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন। কিন্তু ভোট চোরদের সঙ্গে তারা একসঙ্গে সংসদে বসবেন না। বরং নতুন সংসদ শুরু হওয়ার দিন পল্টন ময়দানে তারা জনসভা করে আন্দোলনের সূচনা করবেন। ঐ আন্দোলনে জনগণকে সম্পৃক্ত করে তারা অসহযোগের কর্মসূচি দেবেন।

এর আগে নির্বাচনের পরপরই নির্বাচনের ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করে আওয়ামী লীগ

সভানেত্রী ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, নির্বাচনের ফলাফল তারা মানেন না। সংসদ অধিবেশনে যোগদান করা দূরের কথা, সংসদ সদস্য হিসেবেও তারা শপথ নেবেন না। ঐ একই সময় সংসদের পুনঃনির্বাচনের দাবিতে তারা গত ১০ অক্টোবর দেশব্যাপী অবরোধের ডাক দেন এবং অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার কথাও বলেন। এখন অসহযোগ আন্দোলনকে ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিয়ে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর এই শপথ গ্রহণকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা নির্বাচনের প্রশ্নে তার বড় ধরনের পশ্চাদপসরণ বলে মনে করেন। বস্তুত, শেখ হাসিনা নির্বাচন-পরবর্তী এ যাবৎ সব বক্তব্যেই পয়লা অক্টোবরের বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন করেছেন। এখনও তিনি কথায় সেই অবস্থানে অনড় থাকলেও কাজে যে তিনি আর সেখানে নেই সেটা তার ও তার দলের সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট।

অবশ্য নির্বাচন ও তার ফলাফল সম্পর্কে শেখ হাসিনা প্রথম থেকেই স্ববিরোধিতায় ভুগছেন। নির্বাচনের পূর্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপে উষ্মা প্রকাশ করলেও নির্বাচনের সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি নিয়ে তিনি বা তার দল বিশেষ কোনো প্রশ্ন তোলেননি। বরং বিজয়ী বিএনপি ও তার নেত্রী খালেদা জিয়া নির্বাচনী প্রচারণার শেষ পর্যায় পর্যন্ত 'নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ হয়নি' বলে নির্বাচন সম্পর্কিত তার রিজার্ভেশন দেশবাসীকে জানিয়ে রাখছিলেন। তিনি অবশ্য দাবি করেছিলেন যে, নির্বাচন যদি সুষ্ঠু হয় তবে তার দল সংসদের দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জয়লাভ করবে। অপরদিকে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে নিজেদের আন্ডারডগ হিসেবে প্রমাণিত করে জনগণের সহানুভূতি পাওয়ার চেষ্টা করলেও, নির্বাচনী প্রচারণার সর্বসময়েই বিজয়ের ব্যাপারে আস্থাবান দেখানোর চেষ্টা করেছেন। নির্বাচনের দিন ভোট প্রদান করার পর তিনি সবকিছু ঠিকঠাক মতো চলছে বলে জানান

অরুণ বরুণ কিরণ মালা

অরুণ, বরুণ, কিরণ মালা। রূপকথার রাজকন্যা বা রাজপুত্র নয়। সাটুরিয়ার পালপাড়ার এক পর্ণ কুটিরে এদের বাস। হাসি আর উচ্ছলতায় ভরা তাদের জীবন। প্রতি বছরের বর্ষার পানি নামার সঙ্গে সঙ্গে এই তিন শিশুর প্রাণে পূজোর আনন্দের জোয়ার বইতে শুরু করে। এবারো প্রাণে খুশির বান লেগেছিল কিন্তু মাঝপথে তা ভাটা পড়ে যায়।

নির্বাচন শেষে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলে ওঠে। এই আগুনে অরুণ, বরুণ, কিরণ মালার আনন্দ পুড়ে খাক হয়ে যায়। ষড়ঋতু আর সম্প্রীতির লীলাভূমি এই দেশ বিশ্বে সাম্প্রদায়িক ভূমি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে পড়ে। এরকম এক নাজুক পরিস্থিতিতে একদল সাম্প্রদায়িকতার আগুনকে উসকে দিয়েছে, আরেক দল ধামাচাপা দিতে গিয়ে আরো বাড়িয়ে দিল। সংখ্যালঘু এই সম্প্রদায়কে রাজনৈতিক ঘুঁটি করতে যেয়ে তিন শিশুর সারা বছরের লালিত উৎসবের আনন্দ কেড়ে নেয়া হয়েছে। যারা একাজ করলো তারা ওদের প্রাণের কষ্ট বুঝতে চায়নি বলেই সম্ভব হয়েছে।

এখানে রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে কিছু বললে সড়ক অবরোধ হয়, গাড়ি ভাঙচুর চলে, অনেক ক্ষেত্রে গোটা দেশকে জিম্মি করে তারা হরতাল করে। এমনকি কোনো সন্ত্রাসীকে আটক করা হলে আর তার যদি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে তাহলে সারা দেশে তান্ডব বয়ে যায়। নির্বাচনে মনোনয়ন না পেলে কিংবা বিজিত হলে মহাসড়ক অবরোধ করে হাজার হাজার লোককে কষ্ট দেয়ার ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এই অসহায় মানুষের জন্য তারা কিছুই করেনি। শুধু তাদের কষ্টকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করেছে।

নবাগত সরকার সমাধানের চেয়ে ষড়যন্ত্রের কথা বলে বেড়িয়েছে। সত্যিই যদি ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে তাহলে ষড়ন্ত্রকারীদের শাস্তি দেয়া সরকারের কর্তব্য। আগের সরকারের মতো এরাও ষড়যন্ত্রের কথা বলে প্রকৃত ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের বিশাল বহর নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতি পরিদর্শন করতে গেলেন। সংবাদ সম্মেলন করলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের আটক করতে পারেননি। কাজের তুলনায় তার বাগাড়ম্বরতাই বেশি প্রকাশ পেয়েছে।

পূজোর নবমীর দিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় বিদেশী কূটনৈতিক আর সাংবাদিকদের নিয়ে আটটি হেলিকপ্টারে করে প্রায় ১০ হাজার লিটার তেল খরচ করে (হেলিকপ্টারের পাই-লটের হিসাবে অনুযায়ী) দেশের বিভিন্ন পূজামন্ডপ পরিদর্শন করেছেন। এই তেল পুড়িয়ে সংখ্যালঘুদের মনের আগুন একটুও কমাতে পারেনি। আগুন নেভাতে হলে প্রকৃত ঘটনার নায়কদের আটক এবং শাস্তি দিতে হবে। দোষী ব্যক্তিদের আটকের মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসবে ষড়যন্ত্রকারী কারা। এই ষড়যন্ত্র-কারীদের এ দেশের মানুষ দেখতে চায়। ঘোলা জলে মৎস্য শিকারিদের কারণে দেশ আজ পেছনের দিকে চলেছে।

পূজামন্ডপে আসা পূজারীরা জানায়, দেশের সংবাদপত্রগুলো তাদের বেশি আতঙ্কগ্রস্ত করে দিয়েছে । সংবাদপত্রগুলো যেভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ করেছে, তাতে মনে হয়েছে গোটা দেশে দাঙ্গা লাগলো বলে। তাই তারা সবাই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটায় কখন তাদের এলাকায় দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। এই অশুভ আশঙ্কায় দিন কাটাতে কাটাতে মানসিকভাবে পূজার উৎসব পালনের ইচ্ছে হারিয়ে ফেলে। ধর্মীয় কারণে যতটুকু না করলেই নয় তাই তারা করেছেন বলে উল্লেখ করেন। মানুষকে আতঙ্কগ্রস্ত না করে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরে সংবাদপত্রগুলোর আরো দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া নৈতিক দায়িত্ব ছিল।

অরুণ, বরুণ, কিরণ মালা সাটুরিয়ার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যালয়ের মাঠে স্বর্গের রথ হেলিকপ্টার নামতে দেখে সব বেদনা, কষ্ট ভুলে ক্ষণিকের জন্য উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। রথ থেকে সাদা চামড়ার ডাচ কন্যা এনিস নামার পর তিন ভাই-বোন অবাক বিস্ময়ে তাকাতে থাকে। ভাবে পরীর দেশের রানী তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিরাপত্তা নিয়ে এসেছে। খুশিতে তাদের প্রাণ ভরে ওঠে। কিন্তু হেলিকপ্টারটি আকাশের নীলিমায় মিলিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও বাতাসে মিশে যায়। ভাবে এই স্বপ্নের পরী স্বপ্নের আবির ছড়াতে এসেছে– নিরাপত্তা দিতে নয়। ঘোর কেটে যাওয়ার পরই শিশু প্রাণগুলো আগামী পূজোর কথা ভাবতে থাকে আর শঙ্কিত হয়ে ওঠে। আগামীতেও কি তারা পূজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত হবে?

শারদ রহমান

এবং দাবি করেন যে, তার দল ১৬০ থেকে ১৭০টি আসন পেয়ে সরকার গঠন করতে চলেছে। এখন নির্বাচনে কারচুপি ও ফলাফল পাল্টে দেয়ায় তার অভিযোগ ধোপে টিকছে না।

নির্বাচনে 'স্থূল কারচুপি'র তার দাবি যে জনগণ গ্রহণ করেনি তার প্রমাণ পাওয়া গেছে আওয়ামী লীগ ঘোষিত ১০ অক্টোবরের 'অবরোধ' কর্মসূচির ব্যর্থতায়। সাধারণ মানুষ দূরে থাক, দলের কর্মীরাই ঐ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে আওয়ামী লীগের বিপুল সাংগঠনিক শক্তি থাকার পরও দেশের কোথাও কার্যত ঐ কর্মসূচি পালিত হয়নি। পক্ষান্তরে '৯৬-এর নির্বাচনে 'বিজয় ছিনিয়ে নেয়ার' অভিযোগে বিএনপি যে 'হরতাল' ডেকেছিল তা সফল হয়েছিল।

এই আন্দোলনের কর্মসূচির ক্ষেত্রেই নয়, নির্বাচনোত্তর সময়ে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার জন্য দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে হামলা-আক্রমণ চলে তা প্রতিরোধ করা দূরে থাক, ঐ সংখ্যালঘুদের পাশেও কোনো আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী, এমনকি বিজয়ী এমপিকে পাওয়া যায়নি। তাদের অনেকেই এলাকা ছেড়ে শহরে কেবল নয়, দেশের বাইরেও পালিয়ে গেছেন। এসব ঘটনাবলী দলের মধ্যে যে প্রচন্ড নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি করেছে তাকে অতিক্রম করে কোনো বড় ধরনের পদক্ষেপ নেয়া আওয়ামী লীগের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

কেবল তাই নয়, দলের মধ্যে এখন খোদ শেখ হাসিনার নেতৃত্বই প্রশ্নের সম্মুখীন। মুখ ফুটে বিষয়টি কেউ না বললেও সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ না করার ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা এসেছে দলের নেতা-কর্মীদের মধ্য থেকেই। চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের বিরোধিতা

করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং নেতৃত্বকে সে বিষয় জানিয়েও দিয়েছে। দলের অন্যান্য স্তর থেকেও একই কথা উঠেছে।

কিন্তু তার চাইতে বড় বিষয় এই যে, শেখ হাসিনার যেখানে মূল নির্ভর, সেই ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ নির্বাচনের পর একেবারেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। নির্বাচনের ফলাফল পূর্ণ প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্রলীগ ক্যাডাররা সবাইকে বিস্মিত করে হলের দখল ছেড়ে চলে যায়। নির্বাচনের পর ক্যাম্পাসে তারা একদিনও মিছিল করেনি। দলের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন বেশকিছু দিন কার্যত নিরুদ্দেশই ছিলো। অবস্থাটা এমন যে সংগঠনের হাল ধরারই কেউ নেই। ফলে দলের নেত্রী শেখ হাসিনা বড় বিপাকে পড়েছেন। কর্মসূচি দিলেও যাদের দিয়ে তা বাস্তবায়ন করাবেন সেই শক্তির এই অবস্থায় তা বাস্তবের মুখ দেখানোর কোনো উপায় নেই।

> আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার জন্য দেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর যে হামলা-আক্রমণ চলে তা প্রতিরোধ করা দূরে থাক, ঐ সংখ্যালঘুদের পাশেও কোনো আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী, এমনকি বিজয়ী এমপিকে পাওয়া যায়নি

এই অবস্থায় সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ছাড়া শেখ হাসিনা ও তার দলের নির্বাহী কমিটির সামনে আর কোনো পথ খোলা ছিল না। কিন্তু সংসদ অধিবেশনে যোগ না দেয়ার তাদের সিদ্ধান্ত এরপরও যে বাধা সৃষ্টি করে রাখলো সেটাও দলের জন্য ক্ষতিকর হবে বলে সবার ধারণা। বিশেষ করে পশ্চিমা রাষ্ট্র ও বিদেশী দাতা সংস্থাগুলোর কাছে এ ব্যাপারে তাদের যে কমিটমেন্ট রয়েছে সেই কমিটমেন্ট রক্ষা না করলে তাদের সহানুভূতি থেকেও তারা বঞ্চিত হবেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমা দেশ ও দাতা সংস্থাগুলো কেবল তৎপরই ছিল না, কোনো কোনো সময় তাদের এই তৎপরতা দৃষ্টিকটু পর্যায়েও পৌঁছেছে। কূটনৈতিক সীমারেখার লঙ্ঘন বলে বিবেচিত হয়েছে। এই কূটনীতিকরা নির্বাচনের যে বিশ্বাস-যোগ্যতা ও সংসদের কার্যকারিতা দেখতে চেয়েছেন শেখ হাসিনার এই ভূমিকায় সেটা নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ন হবে। কেবল দেশে অবস্থিত কূটনৈতিক সদস্যদের কাছেই নয়– শেখ হাসিনা প্রাক-নির্বাচনী পর্যবেক্ষণে আসা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের কাছেও একই অঙ্গীকার করেছিলেন। সেই অঙ্গীকার না ভাঙার জন্য জিমি কার্টার নির্বাচনের পর শেখ হাসিনাকে চিঠিও দিয়েছেন।

সুতরাং সংসদের অধিবেশন বর্জন করে রাজপথে আন্দোলনে নামলে শেখ হাসিনা এসব পশ্চিমা দেশ ও দাতা সংস্থাগুলোর বিরূপতার মুখে পড়বেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতির বাস্তবতায় শেখ হাসিনার পক্ষে এটা করা এখন আর সম্ভব নয়। এই অবস্থায় কেবল সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ গ্রহণই নয়, আওয়ামী লীগ সদস্যরা অচিরেই সংসদে যোগ দেবেন এটা ধারণা করাটা অমূলক হবে না।

তবে সবটাই নির্ভর করছে বিএনপি কত দক্ষতার সঙ্গে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে তার ওপর। বিএনপি কেবল বিপুল ভোটেই বিজয়ী হয়নি, সাধারণ মানুষের জনসমর্থন তাদের প্রতিই রয়েছে। আওয়ামী লীগ দলীয় ব্যক্তিরা ছাড়া শেখ হাসিনার নির্বাচনে 'স্থূল কারচুপি'র কথা কেউ বিশ্বাস করে না। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের ওপর বিভিন্ন জায়গায় হামলার ঘটনাকে সবাই নির্বাচনোত্তর উত্তেজনার বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করছে। এখন বিএনপি যদি সে বিষয়ে রাশ না টানে তবে জনগণ ক্রমেই বিরূপ হবে এবং আওয়ামী লীগের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে উঠবে। ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগের সাবেক মন্ত্রীদের পাসপোর্ট আটকের ঘটনা জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বিএনপি যদি এভাবে খুঁচিয়ে ঘা করে তাহলে আওয়ামী লীগের জন্য তাদের অবস্থানের সপক্ষে যুক্তি দাঁড় করানো অসম্ভব হবে না। আর বিএনপি যদি তার আচরণে কিছুটা সহনশীলতার পরিচয় দেয় তবে আওয়ামী লীগের পক্ষে কঠিন কোনো কর্মসূচিতে যাওয়া সম্ভব হবে না।

যাই হোক, দেশের বর্তমান যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে তাতে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদের সংসদে যোগদান না করার সিদ্ধান্ত জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। সংসদে যোগ দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগের ওপর চাপ ক্রমেই বাড়বে এবং আওয়ামী লীগ শেষ পর্যন্ত 'সংসদীয় গণতন্ত্র' রক্ষার কথা বলে সংসদে যোগদানও করবে। তবে তারা অপেক্ষা করবে সংসদে অনুপস্থিত থাকার নব্বই দিনের সময়সীমার মধ্যে বিএনপি তাদের হাতে আন্দোলনের কোনো ইস্যু তুলে দেয় কিনা। এ ধরনের কোনো ইস্যু তুলে দিলেই কেবল আওয়ামী লীগের আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগবে। না হলে দেশের মানুষ সংসদে যোগদান-বর্জন এই লুকোচুরি খেলাই প্রত্যক্ষ করবে অষ্টম সংসদকে কেন্দ্র করে।

আওয়ামী লীগ আবারও ভ্রান্ত পথে...

আওয়ামী লীগ আবারও রাজপথে নামতে যাচ্ছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের চাঙ্গা করতে দলীয় হাইকমান্ড রাজপথকেই বেছে নিচ্ছেন। তবে যে দুইটি ইস্যুতে আওয়ামী লীগ রাজপথে নামতে যাচ্ছে তা খুবই স্পর্শকাতর... লিখেছেন **জয়ন্ত আচার্য**

দেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ নির্বাচনের ফলাফলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে। দলীয় হাইকমান্ড এখনও তাদের করণীয় স্থির করতে পারছে না। নির্বাচনোত্তর নিয়েছে বেশ কিছু আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত। অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা করে দল পিছিয়ে এসেছে। সংসদে শপথ না নেয়ার ঘোষণা দিয়েও শপথ নিয়েছে। এতে দলের হয়েছে মূলত ক্ষতি। আওয়ামী লীগের বিপুল সমর্থকরা আরো হতাশ হয়েছে। নানা স্থানে দলীয় কর্মীদের ওপর শাসক দলের নির্যাতন নেমে এসেছে। দলীয় কর্মীরা এখন বিপর্যস্ত। এমন অবস্থায় আওয়ামী লীগ আবারও রাজপথে নামতে যাচ্ছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের চাঙ্গা করতে দলীয় হাইকমান্ড রাজপথকেই বেছে নিচ্ছেন। তবে যে দুইটি ইস্যুতে আওয়ামী লীগ রাজপথে নামতে যাচ্ছে তা খুবই স্পর্শকাতর। বিষাক্ত সাপ নিয়ে সাপুড়ের খেলার শামিল।

আওয়ামী লীগ তেল-গ্যাস রপ্তানি ইস্যুতে আন্দোলন গড়ে তুলতে চায়। সরকারকে বিপাকে ফেলতে আফগানিস্তানে মার্কিনি হামলার বিরোধিতা করছে।

২৭ অক্টোবর আওয়ামী আইনজীবী আয়োজিত মতবিনিময় অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ সভনেত্রী শেখ হাসিনা আফগান প্রশ্নে সরকারের নীরবতার কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীদের ধরার নামে আফগানিস্তানে চলছে নারী, শিশুসহ মুসলমানদের নিধন। চলছে মানবাধিকার লঙ্ঘন। ইসলামী লেবাসধারী জোট সরকার এ ব্যাপারে কিছুই করছে না। এমনকি তথাকথিত ইসলামী দল জামায়াত নিশ্চুপ। একই সাথে তিনি দেশের তেল-গ্যাস রপ্তানি সম্পর্কে বর্তমান সরকারের নীতির সমালোচনা করে বলেন, দেশের মানুষকে বঞ্চিত করে বিদেশীদের কাছে প্রাকৃতিক সম্পদ বিক্রি করতে দেয়া হবে না। আন্দোলন করে তেল-গ্যাস রপ্তানির প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেয়া হবে। নির্বাচনের আগের চুক্তি অনুযায়ী তেল-গ্যাস রপ্তানির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এ কারণেই আওয়ামী লীগ হেরেছে। পল্টন ময়দানে নির্বাচনোত্তর প্রথম সমাবেশে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা একই সুরে কথা বলেন। তিনি বলেন, আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের সম্পদ তেল-গ্যাস বিদেশীদের হাতে তুলে দেয়ার প্রক্রিয়া প্রতিহত করা হবে। প্রয়োজনে আন্দোলনের পর আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

গত এক দশক ধরে তেল-গ্যাস ইস্যুতে দেশের রাজনীতি নতুন মেরুকরণ হয়েছে। সরকারে থাকতে দল তেল-গ্যাস রপ্তানির প্রক্রিয়া চালিয়েছে। বিরোধী দলে থাকতে তারাই করছে বিরোধিতা। বিরোধী দলে থাকতে তেল-গ্যাস রপ্তানির ইস্যুতে বিএনপি বিরোধিতা করেছে। তবে আওয়ামী লীগ ইস্যুটি নিয়ে হার্ড লাইনে আন্দোলন করতে যাচ্ছে। অথচ তেল-গ্যাস ইস্যুর সাথে জড়িয়ে রয়েছে বিদেশী কোম্পানির স্বার্থ। তথা ভারত ও মার্কিনিদের বড় ধরনের স্বার্থ। রয়েছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক লাভ। জড়িয়ে রয়েছে দেশে বিদেশী বিনিয়োগের বিষয়। দেশের লাভ লোকসানের হিসাব। এ ইস্যুটি নিয়ে আওয়ামী লীগ হার্ড লাইনে আন্দোলনে গেলে আন্তর্জাতিকভাবে বেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। আফগানিস্তানে অমানবিক মার্কিনি হামলার বিরোধিতা করাও আওয়ামী লীগের দীর্ঘমেয়াদি রাজনীতির জন্য ক্ষতিকর হবে। আওয়ামী লীগের হঠাৎ এমন অবস্থান জনগণ সহজভাবে মেনে নেবে না। ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগ অনেক জায়গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। একলা চল নীতি ডেকে এনেছে নির্বাচনে ফলাফল বিপর্যয়।

তেল-গ্যাস রপ্তানি ও আফগানিস্তানে মার্কিন হামলা বিরোধিতা রাজনৈতিক স্পর্শকাতর ইস্যু। ইস্যু দুটোতে আওয়ামী লীগের কিছুটা নীরব ভূমিকা পালন করাই অধিকতর লাভজনক হবে বলে পর্যবেক্ষকদের অভিমত।

আওয়ামী লীগ দেশের প্রধান রাজনৈতিক দল। নির্বাচনে দলটি প্রদত্ত ভোটের ৪০ শতাংশ ভোট পেয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বার্থেই তাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। সংসদ ও রাজপথ দুটো ক্ষেত্রকেই এখন বেছে নিতে হবে। সন্ত্রাস দমনে সরকারের ক্রম ব্যর্থতার ইস্যুতে আওয়ামী লীগ রাজপথে দাঁড়াতে পারে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, দলীয়করণ, দখলসহ বিভিন্ন ইস্যুতে সংসদে গিয়ে কথা বলতে হবে। করতে হবে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা। গড়ে তুলতে হবে জনমত।

নির্বাচনোত্তর প্রথম জনসভায় বক্তব্য রাখছেন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা

আওয়ামী লীগের ৫২ বছরের ইতিহাসে এমন কঠিন সময় খুবই কম এসেছে। বঙ্গবন্ধু হত্যা পরবর্তী বিপর্যস্ত আওয়ামী লীগ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। সামনে কঠিন সময় মোকাবেলায় ধীরস্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বিভিন্ন কারণে আওয়ামী লীগ এখন অনেকাংশে বন্ধু বিহীন। এখন পরাশক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া প্রকৃত সময় নয়। আবারও আওয়ামী লীগ ভ্রান্ত পথ ও ইস্যু বেছে নিচ্ছে।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

দাবি নির্বাচনের

লিখেছেন চট্টগ্রাম থেকে **সুমি খান**

অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবার পর চট্টগ্রামে সর্বাধিক আলোচিত বিষয় সিটি করপোরেশন নির্বাচন। বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, সিটি করপোরেশন নির্বাচন ২০০০ বাতিল করে নতুন নির্বাচন কেন দেয়া হবে না? তাদের দাবি, ৩ জানুয়ারি ২০০০-এর চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে জনগণ অংশ নেয়নি এবং বর্তমান মেয়র ও কমিশনার সবাই ক্ষমতায় অবৈধভাবে আছেন। তবে বর্তমান মেয়র গত নির্বাচনের বৈধতা দাবি করে বলেন, তিনি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেকোনো ধাক্কা সহ্য করার মতো শক্তি তার আছে। গত নির্বাচনের নীরব সাক্ষী চট্টগ্রামের জনগণ। ক্ষমতাসীন সরকার সংসদে মেজরিটির জোরে অনেক কিছু করতে পারে। আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সেই পথে এগুনোই সমীচীন বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। তবে এবার নির্বাচন সুষ্ঠু হলে তার দলের প্রার্থী তিনি বা অন্য যে কেউ নিশ্চিত জয়ী হবেন বলে তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন প্রথম নির্বাচন হয় বিএনপি সরকারের গত শাসনামলের শেষ দিকে। এর আগে বিএনপি মনোনীত মেয়র ছিলেন বর্তমান বেসামরিক বিমান চলাচল প্রতিমন্ত্রী মীর নাছির। প্রথম নির্বাচনে তিনি বর্তমান মেয়র এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রায় ১০ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন।

দ্বিতীয় নির্বাচনের সময় ৩ জানুয়ারি ২০০০ বিএনপির নেতৃত্বাধীন চার দল নির্বাচনের বিরোধিতা করে নির্বাচন প্রতিহত করার উদ্দেশে হরতাল আহ্বান করলেও তাদের কেউ কেউ নির্বাচনে অংশ নেন। নির্বাচিতও হন। এনায়েত বাজার ওয়ার্ডের বর্তমান কমিশনার আবদুল মালেক তাদের অন্যতম। ব্যাপক বোমাবাজি হয় সারা চট্টগ্রামে ৩ জানুয়ারি ২০০০ নির্বাচনের দিন। নির্বাচনের আগে বর্তমান মেয়র প্রকাশ্য জনসভায় এবং পত্রিকান্তরে বিরোধী দলকে আলোচনায় বসার আহ্বান জানালেও তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এ প্রসঙ্গে বর্তমান মেয়রের দাবি, পরাজয়ের আশঙ্কাতেই বিএনপি সেবার নির্বাচন করেনি।

স্থানীয় সরকার পরিষদের অধীনে আঞ্চলিক নির্বাচন হওয়ায় বয়কট ও প্রতিহত

আন্দোলন খুব একটা জোরদার হয়নি বলেও অনেকের ধারণা। এবারের সম্ভাব্য নির্বাচন নিয়েও তাই আশঙ্কার দোলায় দুলছেন বিএনপি নেতৃবৃন্দ।

বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকার সিটি করপোরেশন নির্বাচনে কাকে প্রার্থী করবেন এ নিয়েও রয়েছে জল্পনা-কল্পনা। নগর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দস্তগীর চৌধুরী, আরিফ মঈনুদ্দিন এবং জাতীয় পার্টি নেতা মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরীর নাম শোনা যাচ্ছে। এদের মধ্যে মাহমুদুল ইসলাম চৌধুরী এবং দস্তগীর চৌধুরী এরশাদ আমলে জাতীয় পার্টি মনোনীতি যথাক্রমে মেয়র এবং ডেপুটি মেয়র ছিলেন। বছর কয়েক আগে দস্তগীর চৌধুরী বিএনপিতে যোগ দেন এবং নগর সম্পাদকের দায়িত্ব পান। আরিফ মঈনুদ্দিন বিএনপি নেতা। তবে বেশ কিছুদিন তিনি জনসমক্ষে তেমন কোনো কর্মসূচিতে অংশ না নেয়ায় তার প্রার্থিতা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। এক সময়ে তিনি জনকল্যাণমূলক কিছু কর্মসূচি নেয়ায় অনেকের ধারণা, সেসবের সূত্রে হয়তো তার প্রার্থিতা নিশ্চিত হতেও পারে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আব্দুল্লাহ্ আল নোমান বলেন, অবৈধ মেয়র এবং কমিশনারদের এখনই পদত্যাগ করা উচিত। যেহেতু ভোটারবিহীন নির্বাচনে তারা নির্বাচিত। এ প্রসঙ্গে বর্তমান সিটি মেয়র আলহাজ এবিএম মহিউদ্দিন চৌধুরী সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'সংসদে মেজরিটির অধিকারে তারা অনেক কিছু বলতে বা করতে পারেন, তবে জনগণের মধ্যে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা ঠিক নয়। নোমান সাহেব বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনায় বসে চট্টগ্রামের উন্নয়ন করার কথা বলেছেন। সিটি করপোরেশন নির্বাচন ২০০০ প্রসঙ্গে এ ধরনের মন্তব্য উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা বলে আমি মনে করি। তিনি করপোরেশন কর্মকর্তাদের বাসায় ডেকে কটূক্তি করছেন। তারা তো করপোরেশনের কর্মকর্তা, রাজনীতি করেন না। ভিন্ন রাজনীতি করলে আক্রোশমূলক মন্তব্য বা কর্মকাণ্ড করা ঠিক নয়।'

তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন, '২৫ কোটি টাকা দেনার দায় নিয়ে দায়িত্ব নিয়েছিলাম। এখন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, দাতব্য চিকিৎসালয়, ধাত্রী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ মানব সেবামূলক যা কিছু প্রয়োজন করেছি। সিটি করপোরেশন তো আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয় আঁকড়ে ধরে থাকবো। নির্বাচন হোক না, আমি অথবা আমার দলের অন্য কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে আমরাই জয়ী হবো। আইনের আওতার বাইরে মন্তব্য করা ঠিক নয়।'

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তার দলের না হলেও তিনি সর্বোচ্চ সম্মান পাবার যোগ্য এবং চট্টগ্রাম এলে বর্তমান মেয়র তা দেবেন এই দৃঢ়তা ব্যক্ত করে বলেন, 'তার দলে আমাকে কখনোই নিতে পারবেন না। মৃত্যুর আগে এই মুজিব কোট আমার গায়ের থেকে কেউ খুলতে পারবে না। কিন্তু আমার কাছে বিএনপি-জামায়াত নয়, প্রত্যেকেরই সম্মান প্রাপ্য বলে আমি বিশ্বাস করি।'

বিএনপি সরকারের বিগত শাসনামলের শেষ দিকে বর্তমান মেয়রকে গ্রেপ্তার করা হলে ব্যাপক ভাঙচুর বোমাবাজিতে চট্টগ্রাম নগরী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। এ বিষয়টিও ভাবিত করেছে বর্তমান ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দকে।

সব মিলিয়ে পুরো বিষয়টি বিএনপি-জামায়াত নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের নীতি-নির্ধারকদের ওপর নির্ভর করছে। তবে আরো সাড়ে তিন বছর মেয়াদ পূর্ণ হবার আগেই নির্বাচন ২০০০ বাতিল করলে বর্তমান মেয়র আইনের আশ্রয় নিতে পারেন এমন আভাস পাওয়া গেছে। এতে বিষয়টি ঝুলে পড়তে পারে। আবার এতে বর্তমান মেয়রের জনপ্রিয়তা বেড়ে যাবার সম্ভাবনাও দেখছেন অনেকে। বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'এ বিষয়টি নিয়ে আপাতত ভাবছি না।' তবে চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন বর্তমান সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু এবং যথার্থভাবে বিষয়টি বিবেচনা না করলে সরকারের মাথাব্যথার কারণও হয়ে উঠতে পারে বলে বিশ্লেষক মহলের ধারণা।

যশোর বিএনপিতে শুদ্ধি অভিযান

যশোর জেলা বিএনপিতে দীর্ঘদিন থেকেই দুটি গ্রুপ ছিল। একটি প্রকাশ্য আর অপরটি গোপন। গোপন অংশটি সংখ্যায় বেশি হলেও তারা ছিল দুর্বল। তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। দলকে সন্ত্রাসী, চোরাচালানি, চোর, ছিনতাইকারীদের কবল থেকে মুক্ত করা। কিন্তু সে শক্তি এবং সাহস তাদের ছিল না। দলে নুরউন নবীর মতো শীর্ষ চোরাচালানি এবং তার দলবল থাক, তা তারা কখনোই চাইত না। চাইত না মিছিল-মিটিং আর দলীয় কার্যালয়ে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ভিড় করুক... লিখেছেন যশোর থেকে **মামুন রহমান**

যশোর জেলা বিএনপি ও তার অঙ্গ-সংগঠনে শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছে। যারা সন্ত্রাসী, সমাজ বিরোধী, সংগঠন পরিপন্থী ও নীতি-নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৮১ জনকে বহিষ্কারও করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে এগুচ্ছেন নেতৃবৃন্দ। অন্তত এ পর্যন্ত যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে তাদের নামের তালিকা দেখে তাই মনে হয়। এক সময়ের স্থানীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা কোতোয়ালি থানা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কমিশনারসহ দেশের শীর্ষ চোরাচালান সিন্ডিকেটের পরিচালক নুরউন নবীসহ জেলা বিএনপি'র সভাপতি চৌধুরী শহিদুল ইসলাম নয়নের ছেলে রিপন চৌধুরীও রয়েছে। আরো এমন অনেককে বহিষ্কার করা হয়েছে যাদেরকে শহরের মানুষ খুনি, দুর্বৃত্ত, সন্ত্রাসী, চোর, ছিনতাইকারী, লম্পট হিসেবেই চেনে। দলের নেতাদের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে থেকে যারা ইতিপূর্বে একদিকে নিজেদেরকে যেমন ত্রাস হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছিল, তেমনি দলেরও বাজিয়েছিল বারোটা। দলের নেতারা স্বীকার করুন আর নাই করুন, তাদের কারণে সুষ্ঠু রাজনীতি করতে ইচ্ছুক নেতা-কর্মীরা হয়ে পড়েছিলেন কোণঠাসা। আর সে কারণে দলের বর্তমান সিদ্ধান্তে নেতা-কর্মীরা তো বটেই, সাধারণ মানুষও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছেন। শুদ্ধি অভিযানকে তারা স্বাগত জানিয়েছেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তবে এ নিয়ে সমালোচনাও আছে। আর তাহলো এ পর্যন্ত যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে তাদের মধ্যে এমন অনেকেই আছেন যারা হয়েছেন আক্রোশের শিকার। বাস্তবে তারাই ছিলেন দলের জন্য একনিষ্ঠ নিবেদিত নেতা-কর্মী। আবার দলে এখনো এমন অনেকেই আছে যাদের সন্ত্রাসী ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পরিচয় নেই।

যশোর জেলা বিএনপিতে দীর্ঘদিন থেকেই দুটি গ্রুপ ছিল। একটি প্রকাশ্য আর অপরটি গোপন। গোপন অংশটি সংখ্যায় বেশি হলেও তারা ছিল দুর্বল। তবে তাদের উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। দলকে সন্ত্রাসী, চোরাচালানি, চোর, ছিনতাইকারীদের কবল থেকে মুক্ত করা। কিন্তু সে শক্তি এবং সাহস তাদের ছিল না। দলে নুরউন নবীর মতো শীর্ষ চোরাচালানি এবং তার দলবল থাক, তা তারা কখনোই চাইত না। চাইত না মিছিল-মিটিং আর দলীয় কার্যালয়ে চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা ভিড় করুক। কারণ তাদের কারণে প্রকৃত দলীয় নেতা-কর্মীরা সব সময় কোণঠাসা হয়ে থাকতো। তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর হতো না। বেশি বাড়াবাড়ি করলে জীবননাশের হুমকি দেয়া হত। যে কারণে সুষ্ঠু রাজনীতি চর্চার পক্ষের নেতা-কর্মীরা সব সময় দূরে দূরে থাকতেন। যাতে দল ক্ষতিগ্রস্ত হতো। আর এর জন্য তারা যাকে সবচেয়ে বেশি দায়ী করতেন তিনি হলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলাম। বিএনপির সন্ত্রাসবিরোধী অংশটি বরাবর সন্ত্রাসীদের বিপক্ষে অবস্থান নিলেও প্রকাশ্যে তরিকুল ইসলামের বিরোধিতা করার সাহস তারা

ফটোফিচার

ভোরের হিম হিম হাওয়াই জানিয়ে দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা। এরই মধ্যে বাজারে পৌঁছে গেছে শীতের শাক-সবজি। শহরের কাঁচা বাজারগুলোতে উঠেছে শীতের সবজি। থরে থরে সাজানো এই সব সবুজ সবজি দেখে কার না লোভ হয় গিন্নির জন্য নিয়ে যাবার। কিন্তু দাম আকাশ ছোঁয়া। এই দাম পড়তে মধ্যবিত্তদের হয়ত অপেক্ষা করতে হবে কয়েক মাস।

লেখা ও ছবি– এন্ড্রু বিরাজ

পেতেন না। যে কারণে দলে অন্তর্দ্বন্দ্ব সব সময় লেগেই থাকতো। যাতে দল ক্ষতিগ্রস্ত হত। তবে এ অবস্থার অবসান ঘটে জাতীয় পার্টি থেকে সাবেক মন্ত্রী খালেদুর রহমান টিটো বিএনপিতে যোগ দিলে।

যে কারণেই হোক, নুরউন নবীকে পছন্দ করতেন, তরিকুল ইসলাম। তিনিই ছিলেন তার সবচেয়ে বড় খুঁটি। আর এ সুযোগটিই কাজে লাগাতো নুরউন নবীর চ্যালাচামুন্ডারা। তাদের কার্যকলাপে ক্ষতিগ্রস্ত হতো দল, ক্ষতিগ্রস্ত হতেন তরিকুল ইসলাম

অবসান বলতে দলের সন্ত্রাস ও চোরাচালানবিরোধী অংশ কিছুটা প্রকাশ্যে আসে। এমনকি তারা মিছিল-মিটিংও করে। দলের বৃহৎ একটি অংশ অবস্থান নেয় এ পক্ষেই। এ অবস্থায় দলের কেন্দ্রীয় নেতা তরিকুল ইসলামকে যশোরের সাহসী সাংবাদিক সাইফুল আলম মুকুল ও উদীচী হত্যা মামলায় আসামি করা হলে দলের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়। এক পর্যায়ে তরিকুল ইসলাম পক্ষই কোণঠাসা হয়ে যায়। মামলা- মোকদ্দমায় জর্জরিত হয়ে তরিকুল ইসলাম নিজেও কিছুটা হতবিহ্বল হয়ে যান। দলীয় কার্যালয় এবং মিছিল-মিটিংয়ে ভিড় বেড়ে যায় টিটো পক্ষের। কিন্তু বাস্তবে তারাও সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীদের থেকে দলকে মুক্ত করতে পারেনি। খালেদুর রহমান টিটো পক্ষের এমন কিছু লোক দলীয় কার্যালয় ও মিছিল-মিটিংয়ে ভিড় করতে শুরু করে, যারা শহরের এক নামে সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত। স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় দলের জেলা সভাপতি শহিদুল ইসলাম নয়ন ও সাধারণ সম্পাদক কাজী মুনিরুল হুদা কৌশলে নিরাপদ দূরত্বে থাকতেন, যে কারণে ফ্রন্ট লাইনে টিটো পক্ষ অবস্থান করলেও দলের সাংগঠনিক ভগ্নদশার অবসান ঘটেনি।

২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, দলের সিংহভাগ নেতা-কর্মী যে লোকটিকে সহ্য করতে পারতেন না তিনি হলেন নুরউন নবী। নুরউন নবীর বিরুদ্ধে অভিযোগ। তিনি চোরাচালান সিন্ডিকেটের পরিচালক দেশের শীর্ষ চোরাচালান সিন্ডিকেট শংকরপুরের অন্যতম হর্তাকর্তা। পুলিশের বিশেষ শাখায় চোরাচালানিদের তালিকায় তার নামটি ছিল এক নম্বরে। আর দুই নম্বরে ছিল তার আরেক ভাই যিনি আন্ডার ওয়ার্ল্ডের মাফিয়া ডন হিসেবে পরিচিত আহসান কবীর হাসান । সাধারণ মানুষ যাদেরকে পছন্দ করতো না, তবে সমীহ করতো ভয়ে। কিন্তু যে কারণেই হোক, নুরউন নবীকে পছন্দ করতেন, তরিকুল ইসলাম। তিনিই ছিলেন তার সবচেয়ে বড় খুঁটি। আর এ সুযোগটিই কাজে লাগাতো নুরউন নবীর চ্যালাচামুন্ডারা। তাদের কার্যকলাপে ক্ষতিগ্রস্ত হতো দল, ক্ষতিগ্রস্ত হতেন তরিকুল ইসলাম। এমনকি অনেকেই মনে করেন, শুধুমাত্র নুরউন নবীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত তাকেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। দলের নেতা-কর্মীরা মনে করেন, অন্যান্য সন্ত্রাসীদের কারণে তরিকুল ইসলাম ও দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হলেও তাকে সাংবাদিক সাইফুল

আলম মুকুল ও উদীচী হত্যা মামলার আসামি হয়ে জীবন-মরণের মুখোমুখি হতে হয়েছে শুধু নুরউন নবীর কারণেই। শেষ পর্যন্ত তরিকুল ইসলাম নিজেও তা অনুধাবন করতে সক্ষম হন। আর সে কারণে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন তরিকুল ইসলামকে দেখা যায় এবার। নির্বাচনী প্রচারণায় তিনি একজন সন্ত্রাসীকেও প্রশ্রয় দেননি। পাড়ায়-মহল্লায় গিয়ে একজন চিহ্নিত সন্ত্রাসীও তার পক্ষে ভোট চায়নি। তার অপর দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগ প্রার্থী আলী রেজা রাজু ও স্বতন্ত্র প্রার্থী আজকের কাগজ সম্পাদক কাজী শাহেদ আহমেদ নির্বাচনের আগে শহরে বিশাল বিশাল শো-ডাউন করলেও তরিকুল ইসলাম তা করেননি। নির্বাচনী প্রচার-প্রচারণাকালেও তিনি ছিলেন সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার। যে কারণে সবাই প্রতীক্ষায় ছিলেন বাস্তবে তরিকুল ইসলাম কি করেন তা দেখার জন্য। আর তাদের সে প্রতীক্ষার অবসান তিনি ঘটিয়েছেন নির্বাচনের প্রায় পরপরই। শুধু প্রতীক্ষার অবসান নয়, বলা যায়, অভাবনীয় একটি চমক দেখিয়েছেন তিনি। দলের সব দায়-দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছেন বহুল আলোচিত নুরউন নবীকে। বহিষ্কার করেছেন আরো ৮০ জনকে। যাদের মধ্যে রয়েছেন সাবেক মন্ত্রী খালেদুর রহমান টিটো, শফিকুল ইসলাম বাবুল, অ্যাডভোকেট হাবিবুর রহমান হবি, আফজালুল করিম রানু, সাঈদুর রহমান পিনু, আফজাল হোসেন, মকসিমুল বারী অপু, শহিদুল বারী রবু, মাশুক হাসান জয়, মাহাফুজুর রহমান মানিক, ইয়াহিয়া কামাল ঝন্টু; যুবনেতা তপু, দিপু, বিদ্যুৎ, সুলতান, রিপন চৌধুরী; জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি রায়হান সিদ্দিকী, নুরউন নবীর ভাই মশিউর, ছাত্রদলের এমএম কলেজ শাখার ক্যাডার পারভেজ, কাঞ্চন, মান্না, ভাষা, চাঁচড়ার আনিস, আরবপুরের টিটো, উপশহরের জাহিদ, শংকরপুরের জাফর, ফারুক, মোল্লাপাড়ার লিবন, কারবালার রজিবুল, পালবাড়ির সুজন ও রানা, নীলগঞ্জের বিপ্লব, তুষার ও কামরুল, খালধার রোডের আজগর প্রমুখ।

এই শুদ্ধি অভিযানে ২ শ্রেণীর নেতা-কর্মীকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সাবেক মন্ত্রী খালেদুর রহমান টিটোর পক্ষ গ্রহণ ও বাস্তবিক অর্থেই যারা সন্ত্রাসী, সমাজবিরোধী তাদেরকেই দল থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। অবশ্য খালেদুর রহমান টিটো নির্বাচনের আগেই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সদলবলে বিএনপি ত্যাগ করেন।

এদিকে শুদ্ধি অভিযান নিয়ে দলের মধ্যে দ্বিধাবিভক্তি শুরু হয়েছে। ঢালাওভাবে নেতা-কর্মীদের বহিষ্কার করায় এক পক্ষ এর বিরোধিতা করছে। তারা বলছে, যারা খালেদুর রহমান টিটোর পক্ষ অবলম্বন করেছিলো তারাই বহিষ্কারের শিকার হচ্ছে বেশি। অথচ দলের জন্যে এদের মমত্ববোধের কোনো ঘাটতি ছিল না। বরং এরাই ছিল খাঁটি দলপ্রেমিক। তারা দলের প্রাণপুরুষ তরিকুল ইসলাম আর দলকে বাঁচানোর জন্যই টিটোর পক্ষাবলম্বন করেছিলো। দল বা তরিকুল ইসলাম নয়, তারা অপছন্দ করতো চোরা-চালানি, সন্ত্রাসী, দুর্বৃত্ত সমাজবিরোধীদের। তাদের বিদ্রোহ ছিল নুরউন নবী গংয়ের বিরুদ্ধে। অথচ নুরউন নবীদের পাশাপাশি তাদেরকেও দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অথচ দলে এখনো শতাধিক সন্ত্রাসী রয়েছে, যাদেরকে মানুষ এক নামে চেনে। তারা প্রশ্ন তুলে বলে, শহরের বারান্দিপাড়ার টেনিয়া, বকচরের মিজু, খড়কির মুরাদ, মশে বাবু, পুরাতন কসবার এরাবিয়ান খোকন, খালধার রোডের পটল, টিপু, বেজপাড়ার খায়ের, রানা, ওয়াপদার জাকা ও চঞ্চল, কারবালার নিশাত রায়পাড়ার চঞ্চল, ও জাহাঙ্গীর, চোপদার-পাড়ার মনি, উপশহরের তপন, সুমন, মেজো, আলী, মোজাম, সকো, ছাত্রদলের বর্তমান শীর্ষ নেতা কুয়াশা এদের পরিচয় কি? শহরের মানুষ কিভাবে চেনে তাদের? তাহলে তাদের বহিষ্কার করা হচ্ছে না কেন? দলের একজন শীর্ষ নেতা বলেন, কেউ রক্ষা পাবে না। যাচাই-বাছাই চলছে। তালিকা চূড়ান্ত হলেই তাদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে। এক্ষেত্রে কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুধু দল থেকে বহিষ্কার নয়, দলে যাতে কোনো সন্ত্রাসী ঢুকতে না পারে সে জন্যও জেলা বিএনপি কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে। দলের অঙ্গ-সংগঠনগুলোকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে কোনোভাবেই নতুন কাউকে সংগঠনে ভেড়ানো যাবে না। এজন্য গঠন করা হয়েছে সন্ত্রাস দমন সেল। দলে কাউকে নিতে হলে এই সেলের অনুমতি নিতে হবে। সেল যাচাই-বাছাই করেই তবে অনুমতি দেবে দলে নেয়া যাবে কি যাবে না। আর দলীয় এসব সিদ্ধান্তে দারুণ খুশি শহরের মানুষ। দারুণ খুশি তরিকুল ইসলামের বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে। তাদের অভিমত, সব দল যদি এভাবে শুদ্ধি অভিযান চালায় তাহলে দলে যোগ্য নেতা-কর্মীদের মূল্যায়ন হবে। তাতে দলের সাংগঠনিক ভিত্তি মজবুত হবে। দল হবে গতিশীল। সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। সেই সঙ্গে অপরাধ প্রবণতার পীঠস্থান হিসেবে গোটা যশোরের যে কুখ্যাতি রয়েছে তারও অবসান ঘটবে।

শোক সংবাদ

আজিমুর রহমান ২৩ অক্টোবর রাতে ঢাকা সিএমএইচএ মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি....রাজিউন)। প্রয়াত আজিমুর রহমান দেশের অন্যতম একজন শিল্পপতি ছিলেন। তিনি আর্লিংক্স গ্রুপের সভাপতি ও পরিচালক ছিলেন। রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স-এর প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং মেট্রোপলিটন চেম্বার ও কমার্সের প্রাক্তন সহসভাপতি ছিলেন। এছাড়া তিনি কয়েকটি প্রকাশনার সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। তিনি মিডিয়াস্টার লিঃ-এর সভাপতি ছিলেন। দৈনিক প্রথম আলো এই মিডিয়াস্টারেরই প্রকাশনা। ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টার, সাপ্তাহিক ২০০০ ও পাক্ষিক আনন্দধারা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিঃ-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবেও তিনি কর্মরত ছিলেন।

আজিমুর রহমান প্রথম জীবনে সিপাট ব্যবসায়ী ছিলেন। মিডিয়া জগতের সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল যৎসামান্য। মিডিয়া ওয়ার্ল্ডের পর সেটা বদলাতে থাকে। সাপ্তাহিক ২০০০ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৮ সালে। গোড়া থেকেই তিনি স্বচ্ছ সাংবাদিকতায় নির্ভীক ছিলেন। সম্পাদকীয় মতামতে কিংবা বিভিন্ন বিষয়ে পত্রিকার অবস্থানে তিনি কখনোই প্রভাব রাখার চেষ্টা করেননি। যে জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চাপ পোহাতে হলেও সে কথা আমাদের জানতে দেননি। একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে নিরপেক্ষ সংবাদপত্র চালানো দুষ্কর। বাংলাদেশের মতো জায়গায় তা আরো কঠিন। এটা বাস্তবতা। কিন্তু আজিমুর রহমান সেদিক থেকে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা ছিলেন। আজিমুর রহমানের কুলখানি অনুষ্ঠিত হয় তার বাসগৃহ মরিয়ম হাউসে ২৬ তারিখ বাদ আসর । দেশের মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা, কূটনীতিক ও শিল্পপতিসহ খ্যাতনামা ব্যক্তিবর্গ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। মৃত্যুকালে আজিমুর রহমানের বয়স ছিল ৬৬ বছর। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র ও দু' কন্যাসহ অসংখ্য শুভাকাঙ্ক্ষী রেখে যান। ২০০০-এর পক্ষ থেকে তাদের জন্য রইলো সমবেদনা।

সরকার বদল এবং উপাচার্য নাটক

এমনভাবে তিনি চলে যাবেন, এটা ভাবতে পারেনি ছাত্রলীগের ক্যাডাররাও। আগের দিনও তিনি ছিলেন সজীব, বিজয়ের আশায় উজ্জীবিত। কিন্তু ১ অক্টোবর মধ্যরাতে ময়মনসিংহ শহরের আওয়ামী লীগারদের মধ্যে তিনিই প্রথম পিছু হটেন। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরাও তখনো ক্যাম্পাস ছাড়েনি। তাদের আগেই সপরিবারে ক্যাম্পাসের বাসভবন ছেড়ে শহরে চলে আসেন অধ্যাপক আনোয়ারুল ইসলাম, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।

নির্বাচনের ফল ঘোষিত হওয়ার পর ক্যাম্পাস ছেড়ে এখনো তিনি ফেরেননি। শহরের বাসায় বসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রুটিন ওয়ার্ক করছেন। কর্মচারীরা বাসায় এসে ফাইলপত্রে সই নিচ্ছে। নতুন সরকার এখনো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য নিয়োগ করেনি। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকারের

আমলে নিযুক্ত উপাচার্য আনোয়ারুল ইসলাম পদত্যাগের জন্য রয়েছেন প্রস্তুত হয়ে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কেমন চলছে সেটা সহজেই অনুমেয়।

ঘটনাস্থল উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ধানমন্ডিস্থ প্রশাসনিক ভবন। গত ১৭ অক্টোবর সেখানেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সভা। সকাল ১০টায় সভা শুরু হওয়ার আগেই সেখানে অবস্থান নেন সদ্যগঠিত 'গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদের' নেতারা। সঙ্গে জাতীয়তবাদী পেশাজীবী পরিষদ ও জিয়া পরিষদ সমর্থক কয়েকজন শিক্ষকও রয়েছেন। বিএনপি, জাপা ও জামায়াত সমর্থিত শিক্ষকগণ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষের গেট আগলে দাঁড়ান। তারা দাবি করেন, আগে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পরিবর্তন হবে, তারপর গভর্নিং বডির সভা হবে। এ শিক্ষকদের চাপের মুখে উপাচার্য অধ্যাপক কায়েসউদ্দিন সভা স্থগিত করেন। সেই থেকে তিনি উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে অব্যাহতির দিন গুনছেন।

কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক লুৎফর রহমান এ পশ্চাৎ দৌড়ে আরো একধাপ এগিয়ে রয়েছেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের পরাজয় নিশ্চিত হওয়ার পরপরই জামায়াত-শিবিরের ক্যাডাররা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো হল দখল করে নেয়। তারপর পদত্যাগ করেন প্রক্টর অধ্যাপক রুহুল কুদ্দুস সালেহ। গত ১৯ অক্টোবর এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক

শিক্ষকদের এক যৌথ সভায় উপাচার্য লুৎফর রহমানকে শুধু 'রুটিন ওয়ার্ক' করার আহ্বান জানানো হয়েছে। তারপর থেকে উপাচার্য দু'সপ্তাহের ছুটি নিয়ে ক্যাম্পাস ছেড়ে ঢাকায় অবস্থান করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য বিজ্ঞান অনুষদের ডীন আলাউদ্দিন আহমদকে প্রধান করে ৫ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। সে কমিটিই এখন বিশ্ববিদ্যালয় চালাচ্ছে।

২ অক্টোবর আওয়ামী লীগ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর কমবেশি এরকম অবস্থাই বিরাজ করছে দেশের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে। উপাচার্যরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু রুটিন ওয়ার্ক করছেন। নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্তে যাচ্ছেন না। ফলে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বলতে গেলে স্থবির হয়ে পড়েছে। নতুন করে নিয়োগ, পদোন্নতি কিংবা বড় ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন থেমে গেছে।

সরকার পরিবর্তন হওয়ায় সবচে' অনিশ্চয়তায় পড়েছেন প্রধানমন্ত্রী শাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট, বঙ্গবন্ধু কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (শালনায় অবস্থিত), বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (সাবেক আইপিজিএমআর) ও উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা নির্দিষ্ট মেয়াদে সরাসরি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। প্রধানমন্ত্রীই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর নিয়োগ করেন এবং তার সন্তুষ্টি সাপেক্ষেই তাদের নিয়োগ বহাল থাকে।

তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হচ্ছেন রাষ্ট্রপতি। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নির্বাচনের জন্যে রয়েছে পৃথক সিনেট। সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত ৩ জনের উপাচার্য প্যানেল থেকেই রাষ্ট্রপতি এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী চাইলেই এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনগতভাবে উপাচার্য নিয়োগ করতে পারেন না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সিনেট সদস্যদের একটি বড় অংশ থাকে সরকার কিংবা চ্যান্সেলরের পক্ষ থেকে মনোনীত। ফলে সরকার চাইলেও উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন প্রভাবিত করতে পারে। এ হিসেবে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী ও উপাচার্য আবদুল বায়েস মোটামুটি সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছেন। এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে নির্বাচিত শিক্ষক ও রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধিদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থকরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে এ দু'জন এ মুহূর্তে পদত্যাগ করলে আওয়ামী লীগ সমর্থক শিক্ষকদেরই উপাচার্য প্যানেলে থাকার সম্ভাবনা বেশি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেটের এখন সদস্য সংখ্যা ৮৪। তার মধ্যে শিক্ষক প্রতিনিধি ৩৫ জনের মধ্যে ২০ জন এবং রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি ২৫ জনের মধ্যে ২৫ জনই আওয়ামী লীগের সমর্থক। ফলে সিনেটে তাদের ন্যূনতম ভোট দাঁড়ায় ৪৫টি। এর বাইরে জাতীয় সংসদ সদস্য, চ্যান্সেলর মনোনীত শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, গবেষণা সংস্থা প্রতিনিধি ইত্যাদি মিলে সরকার প্রভাবিত করতে পারে এমন ভোট রয়েছে সর্বোচ্চ ৩৯টি। ফলে বিএনপি সরকার চাইলেই সিনেট থেকে তাদের ইচ্ছেমতো উপাচার্য প্যানেল প্রস্তুত করিয়ে নিতে পারবে না। তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট নির্বাচন নিয়ে একটি মামলা আদালতে চলছে। যদি এ মামলা থেকে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের ভোট প্রদান থেকে বিরত রাখা যায়, তবে হিসাব উল্টো হবে। আদালতের রায়কে পক্ষে নেয়া কঠিন বিধায় উপাচার্য আজাদ চৌধুরীও রয়েছেন সুবিধাজনক অবস্থায়।

তবে তা সত্ত্বেও বিএনপির ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল উপাচার্য অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরীর পদত্যাগের দাবিতে গত ২৯ আগস্ট থেকে ১০ অক্টোবর পর্যন্ত ছাত্র ধর্মঘট পালন করেছে। ধর্মঘট শেষে বিষয়টি সাংগঠনিকভাবেই বিএনপি হাইকমান্ডের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। অন্যদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করতে গিয়ে ছাত্রদলের নিজেদের কার্যক্রমই সাংগঠনিকভাবে স্থগিত হয়ে গেছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সাইদুর রহমান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ফজলী হোসেনকে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থক শিক্ষকরা ইতিমধ্যে শুধু রুটিন ওয়ার্ক পরিচালনার আহ্বান জানিয়েছেন। সরকার তাদেরকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারে বলে তারা আশঙ্কা করছেন।

আওয়ামী লীগ পরাজিত হওয়ায় শুধু উপাচার্যরা নন, নতুন স্থাপিত ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ও অনিশ্চয়তায় পড়েছে। এর মধ্যে প্রথম অনিশ্চয়তাটি সৃষ্টি হয় ঢাকার শেরেবাংলা নগরে স্থাপিত শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে। আওয়ামী লীগ ক্ষমতা ছাড়ার শেষ দিনে গত ১৫ জুলাই শেখ হাসিনা এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তার আগের সপ্তাহে তাড়াহুড়ো করে শেরেবাংলা কৃষি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস করা হয়। আইন পাসের পর শুধু সচিবালয় থেকে সরকারি প্রজ্ঞাপন জারি করাটা বাদ থাকে। এ সূত্র ধরেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক সাদত উল্লাহর নিয়োগ বাতিল করে এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমও স্থগিত করে দেয়।

একইভাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ৬টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পগুলোর কাজ বন্ধ করে দেয়। বিগত সরকারের আমলে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, টাঙ্গাইল,

তানিয়া বাঁচতে চায়

ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত মতিঝিল মডেল হাই স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রী ফারিবা আক্তার তানিয়া বাঁচতে চায়। তার চিকিৎসার জন্য ২০ লাখ টাকা প্রয়োজন। তানিয়ার পরিবারের পক্ষে এই বিশাল ব্যয় ভারবহন করা সম্ভব নয়। গত আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে তানিয়া বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি হয়। তার শরীরের অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে গেলে তাকে মুম্বাই টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তানিয়ার স্বাস্থ্যের অবস্থা এখন ক্রম অবনতির দিকে। তানিয়াকে বাঁচিয়ে রাখতে এই মুহূর্তে প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। তানিয়াকে চিকিৎসার জন্য তার সহপাঠীরা এগিয়ে এসেছে। তানিয়ার স্কুলের সহপাঠীরা টিফিনের টাকা ১ লাখ ৭ হাজার তহবিলে জমা দিয়েছে। এগিয়ে এসেছে হৃদয়বান লোকেরা। তানিয়াকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাকে সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা– সঞ্চয়ী হিসাব নং ৪৫৮৩/২৬, সোনালী ব্যাংক, ফকিরাপুল শাখা, ঢাকা।

পটুয়াখালী ও রাঙ্গামাটিতে এই ৬টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাক্রমে অধ্যাপক মু. খায়রুল আলম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, অধ্যাপক খালেকুজ্জামান, অধ্যাপক আমিনুল হক, অধ্যাপক এইচকেএম ইউসুফ ও অধ্যাপক সেকান্দার খানকে উপাচার্য নিয়োগ করা হয়। কিন্তু এ নিয়োগটি প্রদান করা হয় একেবারে শেষ মুহূর্তে। ১৪ জুলাই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেয়া পরামর্শ অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চ্যান্সেলর হিসেবে ১৮ জুলাই রাষ্ট্রপতি নিয়োগ ফাইলে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে শেখ হাসিনার সর্বশেষ ৩ দিনের সব নিয়োগ ও পদোন্নতির প্রস্তাব রিভিউ করে। সে রিভিউতেই আটকে যায় ৬টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের নিয়োগ। তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়োগ প্রস্তাব সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পরবর্তী নির্বাচিত সরকারের ওপর ছেড়ে দেয়। এই ফাইল এখনো শিক্ষা সচিবের টেবিলে রয়ে গেছে। উপাচার্য নিয়োগ প্রস্তাব আটকে যাওয়ায় এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ফিন্যান্স কমিটি, রিজেন্ট বোর্ড, পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা যাচ্ছে না।

সরকার পরিবর্তনের পর অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে শাহবাগের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৯৮ সালের ৩০ এপ্রিল তৎকালীন আইপিজিএমআর (সংক্ষেপে পিজি হাসপাতাল)কে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়েছিলো। সরকার পরিবর্তনের পর এখন বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের সংগঠন ড্যাব, সরকারি কর্মচারী সমন্বয় পরিষদসহ কয়েকটি সংগঠন আইপিজিএমআর পুনঃস্থাপনের দাবি করছে। অন্যদিকে বিএনপি নির্বাচনী ইশতেহারেও পৃথক মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা রয়েছে। ফলে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন এর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

তবে এর বিপরীত চিত্রও রয়েছে। বিএনপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ায় জগন্নাথ কলেজকে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এ কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় না আসায় জগন্নাথ কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের কার্যক্রম পুরোপুরি থেমে গিয়েছিলো। এবার এ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই জোরালো বলে শিক্ষকরা মনে করছেন।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আগামী ৬ মাসের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী চ্যান্সেলর হিসেবে উপাচার্য নিয়োগ দিতে পারেন– এমন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে । বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপি সমর্থক শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই ঢাকায় এসে এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পাওয়ার জন্য লবিং শুরু করে দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক শিক্ষক পরিষদ নামে জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের সংগঠনটি তৈরি হয়েছে এসব নিয়োগকে সামনে রেখে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নেতা জসিমউদ্দীন আহমেদ এ পরিষদের সভাপতি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ পরিষদের শাখা দ্রুত তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য মনিরুজ্জামান মিয়া ও অধ্যাপক এমাজউদ্দিনের কাছেও বিএনপি সমর্থক শিক্ষকদের একটি বড় অংশ নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য লবিং করছেন।

সরকার পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রশাসনিক স্থবিরতা থেকে দেশের সর্বাধিক সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বেঁচে গেছে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক দুর্গাদাস ভট্টাচার্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। অধ্যাপক দুর্গাদাসের একাডেমিক কেরিয়ারে একটি তৃতীয় শ্রেণী থাকায় সে নিয়োগ আওয়ামী লীগের ভেতরেই সমালোচিত হয়েছিলো। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায় আসার পর এক সপ্তাহ পরই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে পরিবর্তন আনা হয়। তবে নিয়োগ দেয়া হয় আরেকজন বিএনপি সমর্থক অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরীকে। বিএনপি ক্ষমতায় আসায় এখন অধ্যাপক আবদুল মমিন চৌধুরীর পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। ফলে এ বিশ্ববিদ্যালয়টিই এখন মোটামুটি প্রশাসনিক অনিশ্চয়তা থেকে মুক্ত।

সিলেট আওয়ামী লীগ

বিপর্যয়ের মুখে

সিলেটের আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থা কতটা বিপর্যস্ত তা সহজেই অনুমান করা যায় সিলেট-১ আসনে দলীয় প্রার্থী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের একটি ছোট বক্তব্য থেকে। নির্বাচনোত্তর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ৪ অক্টোবরের মূল্যায়ন সভায় মুহিত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'ভোট কারচুপি আর জালিয়াতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ঘোষণা দিয়েও দুশ' কর্মী-সমর্থক পাওয়া যায়নি প্রতিবাদ মিছিলে।'... লিখেছেন **নিজামুল হক বিপুল**

সিলেট অঞ্চলের আওয়ামী রাজনীতি এখন মহা-বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। ১ অক্টোবরের সাধারণ নির্বাচনে ভরাডুবির পর তৃণমূল পর্যায়ে শক্তিশালী সাংগঠনিক অবস্থান থাকার পরও গোটা সিলেট জুড়ে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থা ভেঙে পড়েছে। কিছুদিন পূর্বেও দল যখন ক্ষমতায় ছিল সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মাঝে তখন অনেক এলাকায়ই দোর্দন্ড প্রতাপ ছিল। ছিল প্রাণচাঞ্চল্য। কিন্তু নির্বাচনের পরের দিন থেকে অনেক এলাকায় সেই প্রতাপশালী অতি পরিচিত মুখদের যেমন দেখা যাচ্ছে না, তেমনি চোখে পড়ছে না কোনো প্রাণচাঞ্চল্য। হামলা-মামলার ভয়ে এদের কেউ কেউ এলাকা ছাড়া আবার কেউবা ঘরবন্দি। যার ফলে সিলেটের বিভিন্ন এলাকায় নৌকায় ভোট দেওয়ার কারণে সাধারণ কর্মী-সমর্থক ও সংখ্যালঘুদের ওপর যে নির্যাতনের খড়্গ নেমে এসেছে তার প্রতিবাদ জানানো দূরে থাক, সমবেদনা জানানোর মতো আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু কেন এই অবস্থা? আওয়ামী লীগের অতীত ইতিহাস কি এরকম মৌনতা-নির্লিপ্ততার আভাস দেয়? এই প্রশ্নের জবাবে দলের শীর্ষ ও প্রবীণ নেতা দেওয়ান ফরিদ গাজী বলেন, 'না, আওয়ামী লীগ ভেঙে পড়ার মতো দল নয়। দলীয় নেতা-কর্মীদের আকৃষ্ট করার মতো নেতৃত্বের অভাব রয়েছে দলটিতে। সিলেটের বর্তমান নেতৃত্ব খুবই দুর্বল। তাদের আচার-আচরণে দলীয় নেতা-

কর্মীরা মোটেই সন্তুষ্ট নয়। নেতৃত্ব দিতে হলে ভালো চরিত্রের লোক প্রয়োজন। সক্রিয় রাজনীতিকের দরকার।'

সিলেটের আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক অবস্থা কতটা বিপর্যস্ত তা সহজেই অনুমান করা যায় সিলেট-১ আসনে দলীয় প্রার্থী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের একটি ছোট বক্তব্য থেকে। নির্বাচনোত্তর দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ৪ অক্টোবরের মূল্যায়ন সভায় মুহিত ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'ভোট কারচুপি আর জালিয়াতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ঘোষণা দিয়েও দুশ' কর্মী-সমর্থক পাওয়া যায়নি প্রতিবাদ মিছিলে।' এই হচ্ছে সিলেটে আওয়ামী রাজনীতির বর্তমান চিত্র। এ চিত্র শুধু সিলেট শহরে নয়, গোটা বিভাগ জুড়ে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের অবস্থা আরো ভয়াবহ।

মৌলভীবাজার-৩ (মৌলভীবাজার-রাজনগর) আসনে নির্বাচনের পরের দিন থেকে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারা এতটাই আড়াল হয়েছে, শুধু ওই আসনে দলীয় প্রার্থী আজিজুর রহমান ও জেলা আওয়ামী লীগের শীর্ষ দু'তিনজন নেতা ছাড়া আর কাউকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জেলার রাজনগরে নির্বাচনোত্তর বেশ কিছু সহিংসতা হলেও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা প্রতিবাদ তো দূরের কথা, ন্যূনতম ক্ষতিগ্রস্তদের খোঁজ-খবরটা পর্যন্ত নেয়নি। অথচ দল ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় সংগঠনটির নেতা-কর্মীদের দাপটের কাছে ওই এলাকায় সবকিছু ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ওই এলাকার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক নেতা-কর্মীরা ২০০০কে বলেন, কতিপয় স্বার্থন্বেষী ও লুটেরা নেতাদের কারণে সংগঠনটির আজ এই দুরবস্থা। তাদের কারণে আজ সাধারণ নেতা-কর্মীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

গোটা সিলেট জুড়ে সাংগঠনিক এই বিপর্যয়ের ব্যাপারে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। সংগঠনকে চাঙ্গা করারও কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সর্বত্র একটা ঝিমুনিভাব। সিলেটের প্রায় প্রত্যেক জেলা-উপজেলায় সেই কবে সংগঠনের কাউন্সিল হয়েছিল, তারপর আর নেতৃত্বে পরিবর্তন আনা বা কাউন্সিল করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি কেউ। নতুন ও সঠিক নেতৃত্ব না থাকার কারণে নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে সংগঠনের সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ঘটেছে বলে মনে করে তৃণমূল পর্যায়ের আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। কিন্তু নেতৃত্বের এই সংকটের কথা মানতে নারাজ সিলেট জেলা আওয়ামী লীগের সম্পাদক আ.ন.ম. শফিক। তিনি ২০০০কে বলেন, সিলেট আওয়ামী লীগে কোনো সাংগঠনিক দুর্বলতা নেই। নেতৃত্বে কোনো সংকট নেই। দলীয় কোন্দলও নেই। আমরা নির্বাচনে পরাজয়ের কারণ মূল্যায়ন করে সামনের দিকে এগুচ্ছি। বর্তমানে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে লোকজনের কাছে যাচ্ছি, দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। অন্যদিকে সাংসদ ও প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা দেওয়ান ফরিদ গাজী ২০০০কে বলেছেন, সংগঠনের এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে হলে সহসাই নেতৃত্বে পরিবর্তন আনা দরকার। একই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত নবীনদের নেতৃত্বে নিয়ে আসতে হবে। তাহলেই সম্ভব দলের এই বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠা।

দে • য়া • ল • লি • পি

জাতীয়তাবাদী পূজা

নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা-আক্রমণের প্রতিবাদে দেশের হিন্দু সম্প্রদায় একেবারে অনাড়ম্বর পরিবেশে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। সে অনুযায়ী পূজামন্ডপগুলোতে কোনো আলোকসজ্জা করা হয়নি। ঢাকের বাজনা-আরতি, প্রতিযোগিতা কোনো কিছুরই ব্যবস্থা ছিল না। অবস্থা বেগতিক দেখে ক্ষমতাসীন বিএনপি নিজেরাই পূজা অনুষ্ঠানের দায়িত্ব নেয়। এবার পূজার জন্য, পূজা কমিটিগুলোর জন্য চাল-গমের বিশেষ বরাদ্দ দেয়া হয়। তবে যেটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তাহল কোনো কোনো জায়গায় ক্ষমতাসীন দলের এমপি ও নেতাদের উদ্যোগে আলোকসজ্জা, তোরণ নির্মাণ, মাইকে গান-বাজনার ব্যবস্থা করা। রীতিমতো ব্যানার টাঙিয়েই তারা এ কাজ করেছে। বরিশালের এরকম নির্মিত কয়েকটি গেটে লেখা ছিল– 'সৌজন্যে মুজিবর রহমান সরওয়ার এমপি', 'সৌজন্যে আহসান হাবিব কামাল'– পৌর চেয়ারম্যান প্রভৃতি। পূজা কমিটিগুলোকে বড় আকারের চাঁদা আদায় করে দিতেও পিছপা হয়নি। আর নবমী ও বিজয়া দশমীর দিন বিএনপি মন্ত্রী-এমপিরা নিজ নিজ এলাকার পূজামন্ডপ পরিদর্শনে ব্যস্ত ছিলেন। সব দেখে-শুনে কেউ কেউ এবারের পূজা উদ্‌যাপনকে আখ্যায়িত করেছেন 'জাতীয়তাবাদী পূজা বলে।'

শেখ হাসিনা মল খসিয়েছেন, তবে ঘোমটা আছে

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা তার দলীয় সংসদ সদস্যদের নিয়ে শপথ গ্রহণ করেছেন। বিরোধীদলীয় নেত্রী হিসেবেও তিনি ইতিমধ্যে সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেয়েছেন। নির্বাচনের পর অবশ্য তিনি দাবি করেছিলেন 'স্থূল কারচুপি'র কারণে এই নির্বাচনের ফল তিনি মানবেন না। সংসদে যাওয়া দূরে থাক, সংসদ সদস্য হিসেবে শপথও নেবেন না। ঐ নির্বাচন বাতিলের দাবিতে অবরোধ ডেকেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনেরও ঘোষণা দিয়েছিলেন।
এখন একটু একটু করে সব ছাড়ছেন। শপথ নিয়েছেন। তবে সংসদে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত পাল্টায়নি। আর অসহযোগ আন্দোলন চলে গেছে আরও দূরে। জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে এই অসহযোগ আন্দোলন করা হবে বলে তার সর্বশেষ ঘোষণা। লোকের কথা– মল খসিয়েছেন, কিন্তু ঘোমটা রেখেছেন এখনও। এই ঘোমটাই বা কবে খসবে তার জন্য সবার অপেক্ষা।

নিজামী-মুজাহিদীর পৌত্তলিকতা প্রীতি

বিএনপি সরকারের শরিক কৃষিমন্ত্রী ও জামায়াতের আমির মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা উদ্‌যাপনের জন্য আহ্বান জানান। আর তার মহাসচিব সমাজকল্যাণমন্ত্রী মুজাহিদীকে দেখা গেছে পূজামন্ডপে ঘুরে দেবি বন্দনা সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে কিনা সেটা তদারক করতে। অথচ একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারে ফুল দেয়াকেও এরা 'পৌত্তলিকতা' বলে অভিহিত করেছেন। এখন এই প্রতিমা পূজাকে উৎসাহ দিয়ে তারা নিজেরাই ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছেন কিনা সে ব্যাপারে তারা কি বলবেন?

শুধুই পাউডার

অ্যানথ্রাক্স নয়, শুধুই পাউডার। রাজধানীর কূটনৈতিক পাড়ায় চিঠির মধ্যে পাঠানো পাউডার-জাতীয় জিনিসের ল্যাবরেটরি পরীক্ষা করে জানিয়েছেন বঙ্গবন্ধু চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা। আমেরিকা ও ভারতে অ্যানথ্রাক্স জীবাণুর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ার পর ঢাকাতেও সে ধরনের আতঙ্ক ছড়ানো প্রায় শুরু হয়েছিল। ঢাকার কূটনৈতিক পাড়ায় অবস্থিত দূতাবাসগুলোর কয়েকটি এ ধরনের খাম ও পাউডার পেয়ে রীতিমতো অ্যালার্ম বাজিয়ে তাদের স্টাফ ও সাক্ষাৎকারীদের বের করে দিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সেসব শুধু পাউডারই নয়, এমনকি খামগুলো ঢাকার একই পোস্টঅফিস থেকে পাঠানো। সব খামের হাতের লেখাও এক। বোঝাই যাচ্ছে যে দূতাবাসগুলোকে কেউ ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিল এবং পেরেছেও। কিন্তু প্রশ্ন, যারা পাউডারে এত ভয় পায় তারা অন্য দেশের নাগরিকদের ওপর টন টন বোমা ফেলে কিভাবে!